জবানবন্দী

শঙ্খপল্লব আদিত্য

আমার জন্মসাল ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ৮ চৈত্র, ইংরেজি সনটি সঠিক নয়। তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে বার দুয়েক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বার তিনেক হাইস্কুল বদলের কারণে বারবারই বয়স বদলাতে হয়েছে, তখন তো আর আজকালকার মতো বয়স নিয়ে ততো কড়াকড়ি ছিল না। আমাদের প্রকৃত জন্মসাল বা সময় বলা বোধহয় কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, বাবা মা-র পক্ষেও সম্ভব নয়। আমরা ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন ও সালটি বলি, প্রকৃত জন্মকাল বলা সবার পক্ষেই অসম্ভব, কারণ জন্মবিন্দুর পতন ঘড়ি ধরে হয় না, মহাকালও কি ঘড়ির কাটা মেনে পৃথিবীর পঞ্চপত্রে হানাদারি করে? অতএব ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ৮ চৈত্রকেই রটন্তির ঢাকের মতো বাজিয়ে যাচ্ছি।

আমি জন্মেছি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলা শহরের কালীবাড়ি রোডের ভাড়াটে বাসায়, বাসাটি গোলকপুর ও রামগোপালপুর জমিদার বাড়ির মাঝামাঝি; ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে বড় পিচ সড়কের কাছে। বাবা ছিলেন ডেভিড কোম্পানির পাটের অফিসের বড়বাবু, অনেক টাকার চাকরি, আমার জন্মের পর এক বিরাট তল্লাটের ঘরে ঘরে একটি করে ইলিশ মাছ বিলানো হয়েছিল বলে মা-মাসিদের কাছে কৈশোরে গল্প শুনেছি। কেয়াটখালি থেকে শুরু করে মুক্তাগাছার লাল ইটের গথিক প্রাসাদ অব্দি ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে বড় পিচ সড়ক ও মেঘালয়ের ঢাল পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ব্রহ্মপুত্রের জল ছলাত ছলাতই বোধহয় জীবনানন্দের মায়াবী নদীর পাড়ের দেশ, আমার স্মৃতি ওই সত্তাকেই এখনও সমানে সপাটে উসকে দেয়। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে ময়মনসিংহ শহর, ব্রাহ্মপল্লী-আশুগঞ্জ-গৌরীপুর-ঈশ্বরগঞ্জ-আঠারোবাড়ি-নীলগঞ্জ-গচিহাটা, জামালপুরের নান্দিনাপাড় ইত্যাদি পাটের মোকাম এলাকায় থেকেছি। বেশিদিন কেটেছে আঠারোবাড়ির খালবলায়। নান্দাইলের চণ্ডীনালা ইশকুলে এক বছরের মতো পড়েছি, ওখানেই কবি কাজী নজরুল ইসলামও কিছুদিন পড়েছেন; এখন অনেকেই এটাকেই দৌলতপুর বলছেন। আসল সত্য জানি না, এখন আর জানার উপায়ও নেই। ময়মনসিং-এর ব্রহ্মপুত্র এবং বিশাল বিশাল বড়ো পাতার গাছ এখনও আমার স্মৃতিকে তোলপাড় করে, যা গৌহাটি শহরের ভরালি মুখে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র দেখে এক অতিলৌকিক সম্মোহনের মতো টের পেয়েছি। সেইদিনই বুঝেছিলাম, নাড়ির টান কী এক বিষয়বস্তু বা এক জীবনের প্রত্যক্ষ গরলামৃত।

আসলে আমাদের সাতপুরুষের ভিটেমাটি হচ্ছে, বাংলাদেশেরই কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার কাছাকাছি করিমপুর নামের এক বিশাল গ্রাম। আগেই তো বলেছি, বাবার বদলির চাকরির দৌলতে শৈশবে ও কৈশোরে বহুবার ময়মনসিং ও কুমিল্লা করতে হয়েছে। তিনটে-চারটে করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাইস্কুল বদলেছি, শেষ অব্দি মুরাদনগর হাই ইশকুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কুমিল্লা শহরের ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করি। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের অনার্স ও এক বছরের এম.এ কোর্সে

ভর্তি হই। থাকতাম জগন্নাথ হলে, যা একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদ মিনারের খুব কাছাকাছি। ১৯৬৪-র গোড়ায় নারায়ণগঞ্জের আদমজি ও নরসিংহদি এলাকায় দাঙ্গার পরই বাড়ি আসি। মা মাথায় হাত রেখে ভাত পাতে বসিয়ে প্রতিজ্ঞা করান আর ঢাকা যেতে হবে না, আবার দেশ ছাড়তে হবে। '৬৪-র মাঝামাঝি সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে ত্রিপুরায় চলে আসি। আমার না হলো বি.এ পড়া, না হলো এম.এ। সার্টিফিকেট অনুযায়ী স্রেফ ইন্টারমিডিয়েট। বিমান থেকে একটি মানুষকে মাটিতে ছুঁড়ে মারলে যে অবস্থা হয়, আমার ও আমাদের পরিবারের তাই হয়েছিল। এক অচেনা-অজানা দ্বীপভূমিতে নির্বাসন। এখনও উপসংহার টেনে বলতে পারি না, আমি উদ্বাস্তু, না বাস্তুহারা? অবশ্যই আংশিক ছিন্নমূল, তবে উন্মূল নই। মা ক্যানসারে মারা গেলেন, ওষুধ দিতে তো পারিইনি, এমনকী পথ্যও। হবিষ্যি ও শ্রাদ্ধ হয়েছিল লেখক বন্ধুদের চাঁদায়। আমার প্রথম উপোসী দিনের সংখ্যা ২৩, দ্বিতীয়টি ৪৩, তবে উপবাস নির্জলা নয়, সঙ্গে চা, চারমিনার ও বিড়ি ছিল। ১৯৬৮ সনের অক্টোবরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহশিক্ষকের চাকরি পাই আমি এবং পরিবারের অন্নসংস্থান হয়। ১৯৭৪-এ ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই এক সহশিক্ষিকাকে বিয়ে করে আংশিক ছিন্নমূল থেকে নিম্ন মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছি। এখন দালানে থাকি, বিন্দাস আছি। মাঝখানের কেয়াপাতার নৌকো বা নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে অথবা আরেকটি দয়াময়ীর উপাখ্যান বলে সম্পাদক মশাইয়ের নিমন্ত্রণকে প্রশ্রয়ের মই বানাতে চাইনা। আমার আর আলাদা কোনও জীবনপঞ্জি নেই। কোনওদিন দেখা হলে আমার জীবনের গরলামৃতের বৃত্তান্ত অবশ্যই বলবো। লেখার ইচ্ছে আছে, দেখি আরও একটি বিষাদবৃক্ষ দাঁড়ায় কিনা, এখন ৭৩+ চলছে, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

শংসাপত্রের দলিল মোতাবেক এবং মাস্টার মশাইদের অভিমতে আমার ছাত্রজীবন মেধার আগুনে বেশ উত্তপ্ত ছিল। ইশকুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ চুটিয়ে আবৃত্তি, নাটক এবং ভাষণ দিয়েছি। অনেক পুরস্কারও পেয়েছি, পুরস্কারের বই-এর পরিমাণ ছিল সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বড়ো কালো ট্রাঙ্কে ৭ ট্রাঙ্ক, বইগুলি ট্রাঙ্কে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহবাজপুরের কাছাকাছি এক গ্রামের আত্মীয় বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ওই গ্রামের ১৪ জন হিন্দু নাগরিককে লাইন করে দাঁড় করিয়ে ইয়াহিয়া বাহিনী হত্যা করে, এরপরই,ওদের কু-নজর পড়ে সাত-সাতটি ট্রাঙ্ক ভর্তি বইয়ের দিকে, এরপর ট্রাঙ্কগুলি ভেঙে চুরমার করে বইগুলির অগ্নি সমাধি সম্পন্ন করে। খুব কষ্ট হয়েছিল। এগুলিই ছিল আমার ব্যক্তিগত পরম সম্পদ। এরপর আর ওই সম্পদ পুনরায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ত্রিপুরায় এসে জান বাঁচাতে এমন হিমশিম খাই যে তখন আর ওপারের হারিয়ে যাওয়া বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবনারও কোনো অবকাশ ছিল না। দীর্ঘশ্বাসই ছিল একমাত্র বাঁচার উপায়।

আমি ক্লাস সেভেন-এইটে পড়তে পড়তে লেখালেখি শুরু করি, গল্প, ছড়া ও পদ্য প্রচুর লিখেছি। ওই লেখালেখিকে মশকো কাল বা প্রস্তুতি পর্ব বলা চলে। একটি সংস্কৃত শ্লোক পড়ে এই জীবনে কবি হওয়ার জন্য সংকল্পকে স্থির সিদ্ধান্ত বলে ঠিক করি। ওই সিদ্ধান্ত আমার কাছে ছিল অর্জুন বা একলব্যের মতো। কুমিল্লা কলেজে থাকতে ভালো বক্তা ও

সম্ভাবনাময় লেখক হিসেবে যথেষ্ট নামডাক হয়েছিল। একদিন সহচর তিন বন্ধুর সঙ্গে বাজি রেখে ঢাকার 'সংবাদ' পত্রিকার সাহিত্যের পাতায় একটি গল্প পাঠাই। পরের সপ্তাহেই 'অমীমাংসিত' শিরোনামের গল্পটি ছাপা হয়। প্রথম ছাপার অক্ষরে নাম দেখে অন্য সবার মতোই পুলক ও শিহরণ বোধ করি। সেই শুরু। এরপর ঢাকায় থাকার সময়কালে গল্প ও ছড়া প্রচুর ছাপা হয়েছে বিভিন্ন কাগজে। ঢাকার বংশাল রোডের 'সংবাদ'-এর লেখক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচিত হই। এঁরা হলেন নিয়ামত হোসেন, গোলাম মোস্তাফা, শুভ রহমান, মনজুর আহমেদ, রণেশ দাশগুপ্ত, সন্তোষ গুপ্ত, শহীদুল্লা কায়সার, গোলাম সারোয়ার, মতিয়া চৌধুরী, আবদুল রহিম আজাদ প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা ছিলেন ড. আব্দুল হাই, ড. এনামুল হক, মুনীর চৌধুরী, আহমদ শরীফ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, রফিকুল ইসলাম, ড. গোবিন্দ দেব, সন্তোষ ভট্টাচার্য, নির্মল সেন প্রমুখ। নামের তালিকা আর দীর্ঘ করে নিজেকে শোকায়ত স্মৃতির ভেলায় ভাসাতে চাই না। তবু স্মৃতি সততই পবিত্র শোকের এবং সুখেরও। সম্প্রতি বাংলাদেশের কবি বন্ধু অরুণাভ সরকারের (৭৩) প্রয়াণ সংবাদে দুঃখ পেয়েছি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ওর সঙ্গে বেশ কয়েকটি মাস কাটিয়েছি, যা জীবনের মধুক্ষরা মৌচাক হয়েই থাকবে। জিয়া আহমেদ-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, জিয়া কবি বেলা চৌধুরীর ছোটভাই। জিয়া এখনও বেঁচে আছে। বড় দুই ভাই গিয়াসউদ্দিন কামাল ও বেলা চৌধুরীরা নেই। আমি জিয়ার মুক্তিযুদ্ধের কম্বলটি চেয়ে নিয়েছিলাম, আর ওকে দিয়েছিলাম মায়ের হাতে গড়া একটি নকশি কাঁথা। মুক্তিযুদ্ধের ওই অগ্নিপ্রহরে জিয়ার কম্বলটি গায়ে দিয়ে আগরতলার রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগাম খবর প্রচার করেছি। ওই সময়ে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখক ও কবিদের লেখায় সমৃদ্ধ করে 'সন্দ্বীপ থেকে ধলেশ্বরী' নামের একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত পত্রিকার দুটি সংখ্যা প্রকাশ করেছি। আমি ও চিরব্রত রায়বর্মণ ছিলাম সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে 'সন্দ্বীপ থেকে ধলেশ্বরী' একটি উজ্জ্বল দাগ কেটেছে বলে ইতিহাস লেখিয়েদের অভিমত। আমি সেতুবন্ধনে মুষিক মাত্র। ওপার অর্থাৎ জন্মভূমির কথা উঠলেই রচনা কিছুতেই নাতিদীর্ঘ থাকে না। এই বদভ্যেসটি শেষখেয়া পাড়ির বেলাও কিভাবে অটুট ও অক্ষত থাকবে।

হ্যাঁ, আধুনিক বাংলা কবিতা? এটি আমি শুরু করেছি '৫৬ সাল থেকে, অবশ্যই জীবনানন্দ ও অন্যান্যদের কাঁধে-মাথায় বয়ে প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল '৫৮ সাল থেকেই। '৬৬ থেকে থামাথামি নেই, একসময় তো একনাগাড়ে ৭২ ঘণ্টাও কবিতা রচনা করেছি, যা এখনও চলছে। মাঝখানের স্থগিতকালকে মাত্রাতিরিক্ত অভিমানের অবসরও বলা চলে। কবিতা আমার কছে এক অনিঃশেষ জীবনপ্রণালী। কবিতা ছাড়া আমি থাকতে পারিনা, কবিতাও আমাকে ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে পারে না। কবিতা আমার মা, আমি কবিতারই ঔরসজাত শব্দসন্তান। আমি চাইলেই কবিতার বিষয়, দর্শন, তত্ত্ব বা তথ্যের কোনও সামান্যতম অভাব বা অনটন কোনওদিনই অনুভব করিনি। আমাদের পরিবারে বৈঠকী ও মাটির গানের একটি উজ্জ্বল প্রেক্ষাপট রয়েছে, মায়ের ভোরের গান শুনে ঘুম ভেঙেছে, এখন ভাইপো (পদ্মমৌলিশ্বর আদিত্য)-র শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রেওয়াজ শুনে পুলকিত

হই, ছোটভাই লোকসংগীত শিল্পী। আমিই একমাত্র অ-সুর সামগ্রিক সঙ্গীতায়তনে, তবে সংস্কৃত শব্দ এবং মাটির গানের শ্রুতি ও স্মৃতি আমাকে কবিতার সহচরী করতে প্রাণিত করেছে। আমার বই প্রকাশ, পুরস্কার ও তিরস্কার নিয়ে সুখও নেই, শোকও নেই। বিশেষত প্রচারকে আমি শুধু অপছন্দই করি না, রীতিমতো ভয় পাই। কারণ, এগুলি আমার কাছে কলাপাতার জল, কোনওদিনই তা পদ্মপত্রের নীর হয়নি বা হতে পারেনি। বিশ্লেষণ অপ্রয়োজন; পরিত্যাজ্য। আমি ত্রিপুরায় সব কবিবন্ধু ও সুহৃদদের সঙ্গসুখ এবং সহমর্মিতা পেয়েছি, যা এইরকম বাস্তুহারা প্রায় কাঙালের কাছে সোনার চেয়েও দামি। আমি যোগে বিশ্বাসী, ভাগে বিশ্বাস করি না, ভাগাভাগিকে ঘৃণা করি। আমার ও আমাদের অনেকেরই ধারণা, কলকাতাও আমাদের বাঁচাতে পারে না, ঢাকাও আমাদের বাঁচাতে খুব বেশি এগিয়ে আসবে না। আমরা আমাদের নিজের মতো করেই মাতৃভাষায় নন্দিত করবো। এই মতামত দ্রুত বাড়ছে, আরও বাড়বে।

❑ বর্তমানে ত্রিপুরার বাসিন্দা নির্জনতাপ্রিয় এই কবি উভয় বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব।